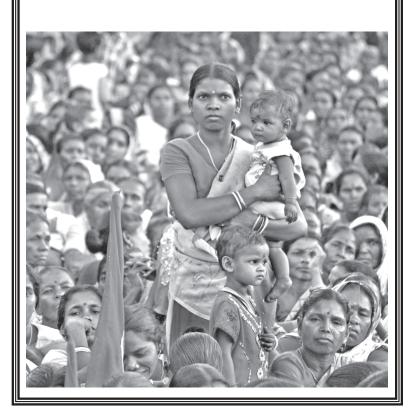
## আদিবাসী অধিকার ও উন্নয়ন

## আন্দোলনই পথ



## দাম : ৩ টাকা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে চণ্ডী চক্রবর্তী কর্তৃক মুজফ্ফর আহ্মদ ভবন, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং জয়ন্ত শীল কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬ থেকে মুদ্রিত। সারা দেশে প্রায় ১০কোটি আদিবাসী মানুষ রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ৫৩ লক্ষ যা এরাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ৫.৮ শতাংশ। এই জনসংখ্যায় ৪০টি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় রয়েছে।যাদের আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আবার আদিবাসী মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিভাজনও রয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বহু সাধারণ সমস্যা রয়েছে, আবার সমস্যার প্রকারভেদও রয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রয়োজন। এজন্য আদিবাসী ও জনজাতি মানুষের উয়য়ন, অধিকার রক্ষা এবং অধিকার অর্জনের সংগ্রামে শামিল হওয়া ছাডা বিকল্প কোন পথ নেই।

আদিবাসী সমাজকে ব্রিটিশরা যে দৃষ্টিতে দেখতো তাতে তাদের কোনো উন্নয়ন সম্ভব ছিলো না। কার্যত মানুষের মর্যাদাও পেতেন না আদিবাসীরা। কিন্তু চা শিল্পের প্রসারে, খনি থেকে লোহা কয়লাসহ বিভিন্ন খনিজ আকরিক তুলে আনতে, রেলপথ পাততে এবং এরকম বহু উন্নয়নের জন্য আদিবাসী শ্রমশক্তিকে প্রায় ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকের মদতে পরাধীন ভারতের সামস্তপ্রভুরা আদিবাসীদের ওপরে যে অত্যাচার করতো তার প্রতিবাদে অতীতে আদিবাসীদের লড়াই সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে, আদিবাসী বিদ্রোহের অনেক ঐতিহ্য আছে। আদিবাসীদের প্রত্যেকটি বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। মহাবিদ্রোহের আগেই ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসকদের কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। বাংলা ও বিহারের একাংশ জুড়ে সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ ছিলো ইংরেজ আমলের স্থানীয় জমিদার, সুদখোর মহাজন ও ইংরেজ কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে। এই সশস্ত্র গণআন্দোলনকে ব্রিটিশ সেনারা নির্মমভাবে দমন করেছিলো। চক্রান্ত করে ধরার পরে সিধো ও কানহুকে হত্যা করেছিলো ব্রিটিশরা। পরবর্তীকালেও ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুন্ডা বিদ্রোহ হয়েছিলো বর্তমান ঝাড়খণ্ডের রাঁচী এলাকাকে কেন্দ্র করে। মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা বীরসা মুন্ডাকে জেলবন্দি করে হত্যা করেছিলো ব্রিটিশ শাসকরা। এছাড়াও চুয়াড় বিদ্রোহ, খেরওয়াড় আন্দোলন, পরাধীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীদের বিদ্রোহের অনেক নজির আছে।

স্বাধীনতার পরেও সারা দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গেও আদিবাসীরা বৈষম্যের শিকার থেকে গিয়েছেন। ফলে তাঁদের প্রকৃত উন্নয়নের বিষয়টি অবহেলিত থেকে গেছে। পুঁজিবাদ এবং আধা সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে আদিবাসীরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার পায়নি। আদিবাসীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, জমি, সংস্কৃতি, জীবিকা কিছুই সুরক্ষিত হয়নি। সামগ্রিকভাবে পশ্চাৎপদ থেকে গিয়েছে আদিবাসীরা। পরবর্তীকালে

নয়ের দশকে নয়া উদারনীতি কার্যকর হওয়ার পরে আদিবাসীরা নতুন করে আক্রমণের শিকার হয়েছেন। জমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে পুঁজিবাদের লুটতরাজ আরও আগ্রাসী রূপ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে পর্যন্ত আদিবাসীদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারগুলি কখনোই আদিবাসীদের সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার দেয়নি। ফলে আদিবাসীদের অধিকারকে অগ্রাহ্য করে তথাকথিত উন্নয়নের কাজ হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। অনেক রাজ্যে খনি, শিল্প, সেচ প্রকল্প, রাস্তাঘাট, রেলপথ তৈরির জন্য বহু সংখ্যক আদিবাসীকে বিনা ক্ষতিপুরণ বা নামমাত্র ক্ষতিপুরণে উৎখাত করা হয়েছে। ২০০৬ সালে বামপন্থীদের চাপে প্রথম ইউ পি এ সরকার আদিবাসীদের জঙ্গলের অধিকার নিশ্চিত করতে ঐতিহাসিক আইন তৈরি করে। কিন্তু বহু রাজ্যে এই আইন মান্য করে আদিবাসীদের জমি চাষ ও বসবাসের অধিকার স্বীকার করা হচ্ছে না। ঝাডখণ্ড, ওডিশা, অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে জঙ্গলের হাজার হাজার একর জমি, খনি, শিল্প ইত্যাদির জন্য শিল্পমালিকদের লিজ দেওয়া হচ্ছে। ওড়িশার ময়ুরভঞ্জের ৪০০০ আদিবাসী পরিবারকে এলাকাচ্যুত করা হয়েছে বেসরকারি কোম্পানিকে শিল্পে জমি দেবার জনা। এর প্রতিবাদে সেখানকার আদিবাসীরা আন্দোলন করলে ওডিশা সরকার গুলি চালিয়ে ১৪ জন আদিবাসীকে হত্যা করেছে। কর্ণাটকের নিয়মগিরি পাহাডের বক্সাইট খনি বেআইনিভাবে বেদান্ত গোষ্ঠীকে লিজ দেওয়া হয়েছে. যে নিয়মগিরি পাহাড় ছিল কোন্ড আদিবাসী গোষ্ঠীর দেবতাস্বরূপ। অন্ধ্র প্রদেশের বিপুল পরিমাণ আদিবাসীদের বসবাসের জমি বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য লিজ দিয়ে আদিবাসীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ওড়িশাতে বেদাস্ত ও জিন্দাল গোষ্ঠীর জন্য ১০০০ হেক্টর বনভূমি দেওয়া হয়েছে। কেবল ২০০০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ভারতে ৪৫ লক্ষ হেক্টর জমি বিভিন্ন প্রকল্পের নামে সরানো হয়েছে। এখনও প্রতি বছর গড়ে ৫০ হাজার হেক্টর জমি সরানো হচ্ছে। গরিব ও শোষিত আদিবাসীরা মূলত বন, পাহাড় তথা জাতীয় সম্পদের উপরই বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল। এখন ঐ সম্পদ বেহাত হওয়ায় তাদের বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার তৈরি হওয়ার পরে সারা দেশের সামনে আদিবাসীদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও অধিকারদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।কেরালায় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারও আদিবাসী মানুষের স্বার্থে উন্নয়নের পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করে।

পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের দুই দিক থেকে উন্নয়নের কর্মসূচি পালন করেছিলো বামফ্রন্ট সরকার। প্রথমত, রাজ্যের গরিব কৃষক, খেতমজুরদের অংশ হিসাবে আদিবাসীরা বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল পান। ভূমিসংস্কারের ফলে প্রান্তিক কৃষকদের সঙ্গে আদিবাসীরাও জমি পেয়েছেন, খেতমজুর হিসাবে বর্গা নথীভূক্ত হয়েছে। ভূমিসংস্কার আদিবাসী গরিব মানুষকেও জমির অধিকারী করেছে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে মোট পাট্টা বিলি হয়েছে ৩০লক্ষ ৩৪হাজার ৭০২টি। বন্টিত হয়েছে প্রায় ১৫লক্ষ ২৫হাজার ১৭৮ একর জমি। সেই জমির মধ্যে প্রায় ২লক্ষ ২৩হাজার ৪৩৫একর জমির মালিক আদিবাসীরা। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৫.৫শতাংশ আদিবাসী হলেও বণ্টিত জমির প্রায় ১৪.৬৯শতাংশের অধিকারী আদিবাসীরা। আদিবাসীদের জমি প্রদানের এই ঘটনা দেশে নজিরবিহীন। রাজ্যের ৫লক্ষ ৪১হাজার ৭০২ টি আদিবাসী পরিবার জমির পাটা পেয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে। আদিবাসীদের মধ্যে বর্গাপ্রাপকের সংখ্যা ১লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৮৫জন। ২০১০ সালের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার বনাঞ্চলের জমির অধিকার আইনের সাহায়ে পশ্চিমবঙ্গে ১৫হাজার ৮৮৩ একরের বেশি বনাঞ্চলের জমির পাট্টা দিয়েছে আদিবাসীদের। সেই পাট্টা পেয়েছেন ২৭হাজার ৭৭৩টি আদিবাসী পরিবার। উল্লেখ্য, জঙ্গলমহলে মাওবাদী-তৃণমূলী উপদ্রবের কারণে সেই সময়ে বনাঞ্চলের জমি চিহ্নিত করা হলেও পাট্টা দিতে সমস্যা হচ্ছিলো। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ এই কাজে অন্যান্য রাজ্যের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলো। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অন্যান্য গরিব অংশের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়েছে আদিবাসীদেরও। আদিবাসীদের জন্য ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণও করেছিলো বামফ্রন্ট সরকার। তাছাডা বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে সুনির্দিষ্টভাবে আদিবাসী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসারে, অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে বহু কাজ হয়েছে। একলব্য বিদ্যালয়, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয় ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। তার ইতিবাচক ফলও পাওয়া গেছে। বামফ্রন্ট সরকারের সার্বিক উদ্যোগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন কুপ্রথা কোনঠাসা হয়ে গিয়েছিলো। চিকিৎসার বদলে ঝাঁড়ফুক করা কিংবা ডাইনী অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে মারা এসব ঘটনা কমে আসছিলো দ্রুত।

আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশ ঘটানোর নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস গ্রহণ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। ২০০০ সালের আগস্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাতেই সর্বপ্রথম সাঁওতালী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি পাস হয়। বামপন্থী সাংসদদের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় ২০০৩ সালে সাঁওতালী ভাষা সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭৯ সালেই বামফ্রন্ট সরকার অলচিকি লিপির স্রষ্টা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে পুরুলিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে তাম্রফ্রলক দিয়ে সম্মানিত করেছিল। আদিবাসীদের সংস্কৃতির প্রতি বামপন্থীদের এমনই শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। ২০০৪ সালে বামফ্রন্ট সরকার সাঁওতালী অ্যাকাডেমি তৈরি করে। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো। চা বাগান এলাকায় শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় ও অধিকার আদায়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়়। দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহল এলাকায় ল্যাম্পসগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেন্দুপাতার দাম পাওয়ায়, সমবায় হিসাবে কাজ করে এগুলি আদিবাসীদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। দেশের মধ্যে প্রথম আদিবাসী বার্ধক্য ভাতা চালু হয়েছিল এরাজ্যে। বামফ্রন্ট সরকার বনসংরক্ষণ কমিটি গঠন ও বন অধিকার আইন কে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন

করেছিল। গরিব পরিবারের মধ্যে ২ টাকা কেজি দরে চাল ও সাইকেল দেওয়া প্রথম শুরু হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার আমলেই।তাছাড়া আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড, হস্টেল ইত্যাদির ব্যবস্থাও করা হয়েছিলো।

আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য একটি বড় পরিকল্পনা এসেছিলো বামফ্রন্ট সরকারের শেষদিকে। প্রথম ইউ পি এ সরকার বামপন্থীদের চাপে বনাঞ্চলে আদিবাসীদের জমির অধিকার সংক্রান্ত আইন পাশ করালে পশ্চিমবঙ্গে তা কার্যকরী করতে নেমে পড়ে বামফ্রন্ট সরকার। তাছাড়া শিল্পায়নের মাধ্যমে আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগও নেওয়া হয়।

কিন্তু ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার আসার পর থেকে আদিবাসীদের অধিকারগুলি আক্রান্ত। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ধংস করার যে প্রয়াস সরকার চালাচ্ছে তার ফলে আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন ধাক্কা খেয়েছে। বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়নে শরিক হওয়ার বদলে আদিবাসী সমাজকে বেশি করে প্রশাসননির্ভর হয়ে থাকতে হচ্ছে। তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে সামগ্রিকভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের ওপরে আক্রমণের ঘটনাও বেড়েছে। পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকছে। এই সরকারের আমলে অনেক আদিবাসী মহিলা দুষ্কৃতীদলের ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। আদিবাসীদের ওপর আক্রমণ ও নির্যাতন বেড়েছেই চলেছে। আদিবাসী মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছেন কোথাও ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। চা-বাগানে অনেক মহিলাকে সমাজবিরোধীরা পাচার করে দিয়েছে দারিদ্রের স্যোগ নিয়ে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে পাওয়া বর্গা ও পাট্টা জমির অধিকার থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, একের পর এক চা বাগান বন্ধ হওয়ায় উত্তরবঙ্গের আদিবাসী শ্রমিকরা সপরিবারে অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন, চা বাগানে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে, কুসংস্কারের আড়ালে ডাইনি অপবাদ দিয়ে আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে দাসপুরে, তালডাংড়ায় আদিবাসী মান্যের ওপর অত্যাচার হয়েছে। সিউডিতে সপ্তম শ্রেণির আদিবাসী ছাত্র লক্ষণ হাঁসদাকে নির্যাতন করেছে পুলিশ। চুরির অভিযোগে বেলপুরের রিকশাচালক তপসিলি যুবক রাজু থান্ডারকে থানায় পিটিয়ে মেরে ফেলেছে পুলিশ। মিথ্যা অভিযোগে সি পি আই (এম) ও আদিবাসী নেতা সুরেন হেমব্রমকে গ্রেপ্তার করেছে প্রলিশ। আদিবাসীদের নিরাপত্তা এখন এরাজ্যে বিপন্ন। আদিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় আইন 'প্রিভেনশন অব অ্যাট্রোসিটিজ এগেনস্ট এস সি/এস টি অ্যাক্ট ১৯৮৯'কে আজও কার্যকরী করেনি তৃণমূলের সরকার। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৫ সালে এই আইন কার্যকরী করার জন্য বিধি তৈরি করেছিল। আদিবাসীদের ওপরে অত্যাচার হলে এই আইন অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের ক্ষতিপুরণে ও পুনর্বাসনে সাহায্য করার জন্য সরকার দায়বদ্ধ। তৃণমূল সরকার সেই দায়িত্ব এডিয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গলমহলের উন্নয়নের অর্থ লুঠপাট করছে শাসকদলের কর্মীরা। পঞ্চায়েতে শাসকদলের দুর্নীতিতে আদিবাসীরা একশো দিনের কাজের প্রকল্পে কাজ পাচ্ছেন না, বার্ধক্য ভাতা বন্ধ, সাঁওতালী ভাষার বই পাওয়া যাচ্ছে না, হস্টেল স্টাইপেন্ড পর্যন্ত পাচ্ছে না। পাথরখাদানগুলো বন্ধ, সাঁওতালী ভাষার শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না, আদিবাসী

ছাত্রছাত্রীদের হস্টেলগুলো বন্ধ, কেন্দুপাতার সরকার ঘোষিত দাম নেই, একে একে বনরক্ষা কমিটিগুলো ভেঙে পড়ছে, অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে এখনো আদিবাসী স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না, আদিবাসী সার্টিফিকেট পেতেও সমস্যা হচ্ছে যার ফলে চাকরিতে নিয়োগে পিছিয়ে যাচ্ছেন আদিবাসীরা। নিয়মানুসারে সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের ৬শতাংশ সংরক্ষণের সুযোগ থাকার কথা। কিন্তু সংরক্ষণের নিয়মও সবজায়গায় মানা হচ্ছে না। আদিবাসীদের জন্য বাজেটে ট্রাইবাল সাব প্ল্যান এ জনসংখ্যার অনুপাতে আর্থিক বরাদ্দ করার কথা। কিন্তু তৃণমূল সরকার সেই কাজও করছে না। আদিবাসীদের সংস্কৃতির উন্নয়নের প্রতি নজর না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ক্লাব, জলসা ইত্যাদির জন্য সরকারি টাকা বিলিয়ে চলেছেন। আদিবাসীদের সংগ্রামী ইতিহাসকে তৃণমূল সরকার প্রকৃত শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে দেখে না। বামফ্রন্ট সরকার আটের দশকে হুল বিদ্রোহের নেতা সিধো ও কানহুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এসপ্ল্যানেড ইস্টের নামকরণ করেছিলো সিধো কানহু ডহর। সাঁওতালি ভাষায় ডহর মানে রাস্তা। কিন্তু ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পরেই ৩০শে জুন হুল দিবসে কলকাতার এসপ্ল্যানেডে সরকারি অনুষ্ঠানে মমতা ব্যানার্জি সিধো কানহুর পাশাপাশি 'ডহরবাবু'র নাম উল্লেখ করেন। আদিবাসীদের জন্য মুখে বড় বড় কথা বললেও আসলে মুখ্যমন্ত্রীর অজ্ঞতা এরকমই।

স্পষ্টতই, বামপন্থীরা এবং বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে আদিবাসীদের উন্নয়নের কাজ করছিলো তা শুধু আদিবাসীদেরই ঐক্যবদ্ধ করেনি, আদিবাসীদের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অনগ্রসর অংশ এবং অর্থনৈতিকভাবে গরিব অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ঐক্যকে দৃঢ় করেছিলো। সামাজিক অনগ্রসরতা ও আর্থিক অনগ্রসরতাকে একসঙ্গে নিয়ে বামপন্থীদের আন্দোলন সামগ্রিকভাবে রাজ্যের গরিব মানুষের ঐক্যকে শক্তিশালী করেছিলো, বিভাজনের শক্তিগুলিকে এরাজ্যে দাঁত ফোটাতে দেয়নি। এই কারণে সাধারণভাবে পরিচিতিসত্তার রাজনীতিগুলি দেশের অন্যান্য অংশে যখন দাপিয়েছে তখনও পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে দাগ কাটতে পারেনি। পাহাড থেকে জঙ্গলমহল রাজ্যের শ্রেণি আন্দোলনের সঙ্গেই মিশেছিলো আদিবাসী ও অনগ্রসরদের উন্নয়নের আন্দোলন। লালঝান্ডার প্রতি আস্থায় আদিবাসী মানুষজন এমনভাবে ছিলেন যে রাজ্যের আদিবাসীগরিষ্ঠ বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্রগুলি থেকে বামপন্থীদের বিরাট ব্যবধানে জয় হতো ধারাবাহিকভাবে। দেশের অন্যান্য অংশে আদিবাসীদের মধ্যে যখন বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা দেখা গেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে তা তেমনভাবে হয়নি। ঝাড়খণ্ডিরা এরাজ্যে মাথা তুলতে পারেনি চেষ্টা করেও। পাহাড়ে চা বাগানের আদিবাসী ও নেপালীভাষী শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য ভাঙতে পারেনি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। কিন্তু বড ধরনের চক্রান্তের ছোবল এলো বামফ্রন্ট সরকারের শেষদিকে। বাংলার মানুষের ঐক্যকে ভেঙে পরিচিতি সত্তার রাজনীতির আক্রমণ এলো হিন্দু মুসলিম ধর্মের নামে, ভাষার নামে, জাতপাতের নামে এবং আদিবাসী পরিচিতি সন্তার নামে। সেই সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস প্রতাক্ষভাবে বিভাজনের রাজনীতিকে মদত দিয়েছে বামফ্রন্ট বিরোধিতার লক্ষ্যে। চরম দক্ষিণপন্থী বি জে পি থেকে শুরু করে পথভ্রম্থ উগ্র বামপন্থী মাওবাদীরাও তাদের সঙ্গ

দিয়েছে। এসবেরই পরিণামে ২০১১ সালের পরবর্তীতে। এখন এ রাজ্যে আইনের শাসন নেই। সরকার দুষ্কৃতীকে পুরস্কৃত করছে। জাতি বৈষম্য ও বর্ণ বিদ্বেষ নতুন করে সৃষ্টি করা হচ্ছে। সর্বত্র নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই রূপ ভয়ংকর পরিস্থিতি আগে কখনো সৃষ্টি হয়নি রাজ্যে শুধু তৃণমূলের গণতন্ত্র ধংসের জমানাই আসেনি, মাথা তুলেছে সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতের বিভেদের রাজনীতি।

আর এস এস এবং তাদের রাজনৈতিক শাখা বি জে পি এই পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে পুরোদমে নেমে পড়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে চেষ্টা করেও যা তারা সেভাবে করতে পারেনি এখন সেই কাজ তারা প্রবল গতিতে করে চলেছে জেলায় জেলায়। হিন্দুত্ববাদীরা আদিবাসীদের বিভ্রান্ত করে তাদের চরম দক্ষিণপন্থী অ্যাজেন্ডায় নিয়ে আসতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে সারা দেশেই। এরাজ্যেও সেই পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে চতুরতার সঙ্গে, তৃণমূল সরকারের বিনাবাধায়।

আদিবাসীদের সম্পর্কে আর এস এস-এর মতাদর্শগত অবস্থান কী? আদিবাসীরা সাধারণভাবে প্রকৃতির পুজারী। তাঁরা প্রচলিত ধর্ম অনুসরণ করেননা। বিভৃতিভৃষণের আরণ্যকে তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গাছ, পাহাড়, প্রকৃতি এসবই তাঁদের জীবনের সঙ্গে জড়িত এবং এগুলির মধ্যেই তাঁদের আরাধ্য। হিন্দু দেবদেবীর পুজার সঙ্গে তাঁদের ধর্মীয় আচার আচরণের পার্থক্যও অনেক। আর এস এস-ও সেকথা জানে। কিন্তু কৌশলগত কারণে তারা আদিবাসীদের হিন্দু বলে দাবি করে। হিন্দুত্বাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানুষকে প্ররোচিত করে লড়াই পাকাতে লড়াকু আদিবাসীদের ব্যবহার করতে চায় সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ সংগঠিত করতে। এই কারণে আদিবাসীদের প্রথাগত ধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আদিবাসীদের হিন্দুত্ব অঙ্গীভৃত করতে উঠে পড়ে নেমে পড়েছে তারা, আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতিকেও একই সঙ্গে ধংস করে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি চাপিয়ে দিচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদীরা যে 'রামরাজত্ব' কায়েমের কথা বলে সেখানে শূদ্র অর্থাৎ দলিত ও আদিবাসীদের স্থান সমাজের নিচের তলায়, কেবল কঠোর শ্রমদানে। রামায়ণের কাহিনী অনুসারে শস্থক শূদ্র ছিলেন। তিনি তপস্যা করছিলেন। শূদ্ররা তপস্যা করতে পারে না বলে রাম মনে করতেন। তাই ধ্যানে বসে থাকা অবস্থাতেই তাঁর গলা কেটে হত্যা করে রাজধর্ম পালন করেন রাম। এই ধরনের ধর্মাচরণে বিশ্বাসী হিন্দুত্ববাদীদের নির্যাতনে হায়দ্রাবাদের মেধাবী ছাত্র রোহিত ভেমুলাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে।

সেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ এখন দলিত ও আদিবাসীদের নিজেদের অনুগত বাহিনীতে নিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বরে আর এস এস তৈরি হয়। আদিবাসীদের সংগঠিত করার জন্য বনবাসী কল্যাণ আশ্রম তৈরি হয় ১৯৫২ সালে। প্রতিষ্ঠাতা রমাকান্ত কেশব দেশপান্ডে।পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে সঙ্ঘ কাজ শুরু করেছে ১৯৯০-৯১ সাল থেকে। কিন্তু তা গতি পেয়েছে ২০১১ সালের পর। তবে আশ্চর্যজনকভাবে ২০০৭-০৮-তে এরাজ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টির দিনগুলিতে জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের মধ্যে সঙ্ঘের সক্রিয়তা দেখা গেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের পরিকল্পনায়

অনেকগুলি সংগঠন পরিচালিত হয়। যেমন সেবা ভারতী, সংস্কার ভারতী, বিদ্যাভারতী, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ প্রভৃতি। তেমনই একটি সংগঠন বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম মূলত আদিবাসীদের মধ্যে সঙ্গের কাজ করে।

পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন অংশে আদিবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারীদের সক্রিয়তা অনেকদিনের। তারা আদিবাসীদের শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রকল্প নিয়ে কাজ করেছে এবং তাদের কার্যকলাপের ফলে বহু আদিবাসী খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আর এস এস-এর মূল লক্ষ্য, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী আদিবাসীদের হিন্দুছে আকৃষ্ট করা। এই লক্ষ্যে নানা কৌশল নেয় সঙ্ঘ। কোথাও নানা প্রলোভনে 'ঘর ওয়াপ্সি' ঘটায়। অর্থাৎ খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী আদিবাসীদের 'আবার হিন্দু' বানায়। এই ক্ষেত্রে ধর্মান্তরিতদের কাজ, চিকিৎসার দেখভাল, টাকা পয়সা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয় তারা। এই পুণর্হিন্দুত্বকরণের কাজটি মূলত করে সঙ্ঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। একাজ করার জন্য তারা খুব শান্তিপূর্ণভাবে মিশনারিসূলভ আচরণই করে থাকে এমন নয়। প্রলোভনের মতোই ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাস ইত্যাদির ব্যবহারও করে। যেমন ওডিশার কন্ধমালে তারা খ্রেস্টানদের চার্চগুলি ভেঙে পুড়িয়ে দিয়েছে। খ্রিস্টান মিশনারি গ্রাহাম স্টেইনসকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গেও আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সংঘের অন্যান্য সংগঠনগুলি। ২০১৫ সালের ২৮শে জানুয়ারি বীরভূমে এরকমই করেছিল তারা। সেদিন রামপুরহাট ১নং ব্লকের বনহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খরমাডাঙা গ্রামের আদিবাসীপাড়ায় বীরভূম, ঝাড়খণ্ড ও মুর্শিদাবাদের একশোর বেশি খ্রিস্টান আদিবাসীকে নিয়ে এসে 'শুদ্ধিকরণ'-এর নামে অনুষ্ঠান করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। যাগযজ্ঞ করে শতাধিক খ্রীস্টান আদিবাসীকে হিন্দুধর্মে 'দীক্ষিত' করে তারা। জেলার পুলিশ প্রশাসন এই ধর্মান্তরকরণ ঠেকাতে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এই নিয়ে কোনো সরকারি অনুসন্ধানও হয়নি। জেলাশাসক পি মোহন গান্ধী এবং জেলার পুলিশসুপার অলোক রাজোরিয়া দুজনেই জানিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে ধর্মান্তরকরণের কোনো খবর নেই।

সেদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা যুগল কিশোর ধর্মান্ডরিতদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, "এই আদিবাসীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি এখন থেকে দেখবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।" এলাকায় সংগঠনের পক্ষ থেকে আদিবাসী ছাত্রাবাস ও সেবাকেন্দ্র খোলার কথাও ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে সেদিনই, একই সময়ে রামপুরহাটে সমাবেশ মঞ্চে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ তোগাড়িয়া বলেছিলেন, হিন্দুদের চাকরি দিতে তারা প্রকল্প নিয়েছেন। টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে নাম নথিভুক্ত করলেই মাসে ১৫/২০ হাজার টাকার রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, ১কোটি হিন্দুকে চিকিৎসা করানোর প্রকল্পও তারা নিয়েছেন বলে তোগাড়িয়া জানিয়েছিলেন। যদিও বাস্তবে এসবের কিছই হয়নি।

সেবা ভারতীর মাধ্যমে সঙ্ঘের লোকজন মূলত গ্রামাঞ্চলে নানা কাজ করে। কোথাও

স্বনির্ভর গোষ্ঠী চালায়। কোথাও অ্যাম্বুলেন্স। কোথাও আবার কম্বল বিতরণ, দুঃস্থদের জামাকাপড় বিতরণ করে। রাজ্যের জঙ্গলমহল কিংবা আদিবাসী প্রধান এলাকায় এমন কিছু কিছু কাজ তারা করে। আসল লক্ষ্য অবশ্য ধর্মান্তরকরণ।

বিদ্যাভারতীর মাধ্যমে তারা স্কুল চালায়। গত পাঁচ বছরে এমন স্কুলের সংখ্যা অনেক বেডেছে। বেডেছে আদিবাসী এলাকায়। প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকায় তারা মূলত 'একল বিদ্যালয়' চালায়। একল মানে যে স্কুলে একজনই শিক্ষক। তবে এই স্কুল চালিয়ে আদিবাসীদের কাছে টানার কাজ এই রাজ্যে তারা ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে বেশি করছে। ২০১৬-র এপ্রিলের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে সারা দেশে সঙ্ঘের বিদ্যালয় চলে ১২ ,৩৬৩টি। তার মধ্যে বনবাসী এলাকার স্কুল ৪৪৭টি। সংখ্যার হিসাবে বিশাল কিছু নয়। কিন্তু গত একবছরে তা আরও বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের ৩০৯টি স্কুল চলে। এর মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের চার জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকডা, প্রুলিয়া এবং বীরভূমে যথাক্রমে ৫৪টি, ৩১টি, ১৩টি এবং ২০টি স্কুল চলে। আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে সঙ্গের স্কুল চলে ২৪টি। এরও একটি বড় অংশ আদিবাসী এলাকায়। রাজ্যে সঙ্ঘের স্কুলগুলির মোট ৬৬ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী। পশ্চিমাঞ্চলের চার জেলা এবং চা বাগান নিবিঢ় উত্তরবঙ্গের দুই জেলা মিলিয়ে ছ'টি জেলায় সঙ্ঘের ১৪২টি স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি। এর একটি বড় অংশ আদিবাসী। বীরভূমের মল্লারপুরে সঙ্ঘের একটি বড় স্কুল আছে। যেখানে অনেক আদিবাসী ছাত্রছাত্রী থাকেন। ২০০৩-এ, বেলপাহাড়ির কাঁকড়াঝোড়ে আর এস এস হাজির হয়ে স্কুল খোলে। বেলপাহাড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা, কাঁকরাঝোড় তো বটেই, তখন মাওবাদীদের কারণে আতঙ্কের এলাকা। পরপর নাশকতা ঘটেছে সেখানে। ২০০৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারিতে বেলপাহাড়ির দলদলিতে পুলিশের গাড়ি উড়িয়ে দিয়েছিলো মাওবাদীরা, ৭জন পুলিশ কর্মী, একজন গ্রামবাসী ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন রাজ্যের বিরোধীদল তথা বর্তমান রাজ্যের শাসক দলের সহযোগিতায় ও উদ্যোগে তথাকথিত মাওবাদীদের সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলের তিন জেলায় বাঁকুড়া পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ব্যাপক সন্ত্রাস বীভৎস আক্রমণ ও খুন সন্ত্রাস সংগঠিত হয়েছিল। সন্ত্রাসকারীদের হাতে নৃশংসভাবে রাজ্যে ৩৩৭ জন খুন হন।এর মধ্যে আদিবাসী মানুষের সংখ্যাই ১২৭ জন। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস মানুষ কখনোই ভুলবে না। আর এস এস কর্মীরা কিন্তু তখনও বহাল তবিয়তে কাজ করেছে তথাকথিত 'রেড করিডর'-এ। আসল কথা, মাওবাদীদের সঙ্গে সেই সময়ে তৃণমূলের যৌথবাহিনীই যাবতীয় সন্ত্রাসের কাজ চালাচ্ছিলো। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য বামফ্রন্ট সরকার ও সি পি আই (এম) কর্মীরা হওয়ায় তখন আর এস এস-র সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিল।

আর এস এস-বি জে পি-র হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শে নারী, আদিবাসী ও দলিতদের প্রতি কোনো মর্যাদা নেই। মোদী সরকারের আমলে তারা বারে বারে আক্রান্ত। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টিতে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘূদের আক্রমণে আদিবাসী ও দলিতদেরই হাতিয়ার করছে তারা। বি জে পি এবং আর এস এস-এর আসল লক্ষ্য হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে ভাঙা। এরজন্য তারা পরিচিতি সন্তার রাজনীতি ব্যবহার করছে। আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষ যারা নিজেদের কৃষক খেতমজুরদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে, কয়লা খনির ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনে, কিংবা চা বাগানের ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত রেখেছেন তাঁদেরকে আদিবাসী সন্তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে বি জে পি দুর্বল করতে চেষ্টা করছে। গরিব শ্রমজীবী মানুষের শিবির থেকে বিযুক্ত করে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বে যুক্ত করেত চাইছে আদিবাসীদের। একমাত্র শ্রেণি ঐক্য গড়ে জোরদার শ্রেণি আন্দোলনের পথেই বি জে পি-র এই বিভেদকামী প্রচেষ্টাকে রুখে দেওয়া সম্ভব।

আদিবাসী সমাজের জলন্ত সমস্যার সমাধান করতে চাই আরও ব্যাপক আন্দোলন ও সংগ্রাম। অতীতে আদিবাসী মানুষ বারে বারে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন আপসহীনভাবে। তারা অনেক এগিয়েছেন, কিন্তু আরও এগোতে হবে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় নানা ধরনের সামাজিক সংগঠন অনেক আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইধরনের সংগঠন ক্ষুদ্র স্বার্থে, সীমিত সাময়িক স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য সক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। এতে আদিবাসীদের সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না। শ্রেণি আন্দোলন ও গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদিবাসী সমাজের বৈপ্লবিক রুপান্তর ছাড়া বৃহত্তর অংশের অধিকার সুরক্ষিত হবে না। আদিবাসী সমাজের স্বার্থ রক্ষাকারী দায়িত্বশীল সামাজিক সংগঠন হিসেবে আদিবাসী অধিকার মঞ্চ সেই প্রয়াস নিয়েই আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।